প্রেমের বিয়ে বিয়ের প্রেম

স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের পুরনো বিন্যাস নেই, সময়ের কারণে অচল। নতুন দম্পতিরা নতুন সমাজ প্রেক্ষাপটে কিছু বিভ্রান্ত। গ্রামীণ পরিবার আগেই ভেঙেছে, নতুন প্রেক্ষিত পেয়েছে। নগরেও তাই ঘটছে। এই আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'প্রেম' অবস্থান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত চাইছে সাপ্তাহিক ২০০০। এই সূচনা পর্বটি লিখেছেন মোহসিউল আদনান

'হানিমুন ইজ ওভার'... 'মধুযামিনী শেষ'... এর পরের অনুক্ত কথাটা হলো সংসার সংগ্রাম শুরু। অর্থাৎ প্রচলিত সাধারণ অর্থে, রসিকতার মতো করে বলা হলেও, প্রেম পর্বের শেষ। নব্য বিবাহিতের আপত্তি এখানেই। তার প্রশ্ন হলো আমরা বিবাহিত জীবনকে সংগ্রাম বলছি, সংগ্রামটি কি প্রেম নয়? দু'জনে নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে। দু'জনে লড়াই করছে এর মধ্যে প্রেম দেখি না কেন?

আলোচনার মোড় ঘুরে গেলো। কারণ এই জীবন সংগ্রামের ভেতর দু'জনের সম্পর্ক একটি বন্ধনীতে চলে আসে তা সবাই জানে। তারপর কেন এর থেকে প্রেমকে বিযুক্ত করছি।

এখানে প্রশ্ন হলো প্রেম কি?

প্রেমের তাত্ত্বিক দিক হলো জান্তবতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ যেসব বিষয় মেধা দিয়ে তৈরি করেছে তার একটি হলো প্রেম, হৃদয় ইত্যাদি। মানুষকে মানবিক করেছে প্রেম। তা না হলে মানব মানবীর সম্পর্কের মৌলিক হলো রিপ্রডাকশন। দু'জন মিলে প্রজন্ম রক্ষা করা। এই জান্তবতাকে মানুষ মনন দিয়ে সৃজনশীল করেছে। শুধু প্রজন্ম বলতে মানুষ পছন্দ করছে না, বলছে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটাচ্ছে, সংস্কৃতির ক্রমান্নয়তা রাখছে। বিয়েটাও সেই সংস্কৃতি। মানুষের তৈরি সভ্যতার উপাচার, প্রেমের সামাজিক বন্ধন।

প্রেম কি? এখানে এসে বিয়ে আগে প্রেম এবং বিবাহিত জীবনের প্রেমের মধ্যে একটি আপেক্ষিক দ্বন্দ্ব তৈরি করা হয়েছে। আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় এটিই। এটা কি দু'রকমের প্রেম? অথবা প্রেমে রূপান্তর।

যিনি আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেন তাকে বলা হলো, বিবাহিত জীবনে প্রেম নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছে না, এটা অনেকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত আলোচনায় এই কথা ওঠে। কারণ মধ্যবিত্তের পুরো জীবনটাই সংগ্রামের। বিয়ে হলো কমিটমেন্ট। জীবনযাপনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে দু'জন। কমিটমেন্টে কিন্তু লড়াইও থাকে।

এই আলোচনায় যোগ দিলেন হৃদয় জানালার সুচরিতা। তিনি তো নানা জানালায় উঁকি দেন। অনেক সময় তিনিও সমস্যায় পড়ে যান কি উত্তর দেবেন।

সবাই যখন তুমুল তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত, সুচরিতা উঠে গিয়ে নিয়ে

এলেন তার বিভাগের কয়েকটি চিঠি। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সুচরিতা চিঠিগুলো সামলে বললেন, এগুলো কেউ দেখবেন না। এটা আমার আর লেখকের মধ্যে গোপনীয়তা। একটি চিঠি দেখাবো। দু'দিন ধরে ভাবছি কি উত্তর দেবো। মূলত অল্প বয়সীরা লেখে প্রেমজনিত সমস্যার সমাধান চেয়ে। আকুতি আছে সেই পত্রে কিশোর-কিশোরীদের। একই সঙ্গে অবিবাহিত নারী-পুরুষ এবং বিবাহিত নারী-পুরুষও। মোটা দাগে সমস্যাগুলো দেখলে দেখা যায় প্রেমের সময় চিন্তা, বিয়ে হবে তো? এভাবে আর কত দিন? পরিবার কি মেনে নেবে? কিংবা অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ে অভিমান করে বসে থাকা, দূরত্ব তৈরি হয়ে যাওয়া, মিলনের অপেক্ষা...। এদের সব কটি চিঠিই কিন্তু একরকম। হয় প্রেম ব্যর্থ হতে চলেছে বা মেয়েটা ছেলেটাকে ভুলে গেছে সে ভুলতে পারছে না ইত্যাদি লেখেন। সুচরিতা চিঠিটা খুলে হাতে রাখলেন। না পড়ে সংক্ষেপে বললেন, চার বছর প্রেম করে বিয়ে করেছে। এর চিঠিটা অর্থহীন। এক অর্থে। স্বামী কবিতা লিখতো প্রতিদিন। প্রতিদিন দেখা হলে একটি ফুল দিতো। প্রতিদিন চিঠি লিখতো। জমিয়ে রাখতো। দেখা হলে এক সঙ্গে তারিখ ধরে ধরে চিঠিগুলো দিতো। এখন স্বামীটি ওসব করে না। অফিস থেকে ফেরে হয় কুমড়ো নিয়ে না হয় ইলিশ নিয়ে। এবং আব্দার ধরে বসে রাতেই সে খাবে। স্ত্রী এটা মানতে পারছে না। সুচরিতা বললেন, বলুন এর উত্তর কি দেবো?

এই প্রেমিক-প্রেমিকাই যখন সব সমস্যা কাটিয়ে বিয়ে করে তখন তাদের যেন বাঁধাহীন জীবন। কোনো সমস্যাই থাকে না। ঘোরের মধ্যে বসবাস, অনেকটা প্রেম জীবনের শুরুর মতো। এভাবে চলে কয়েক দিন। তারপর দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। স্বপ্ন আর বাস্তবের। প্রেম জীবনের স্বপ্নগুলো বিবাহিত জীবনের বাস্তবতায় সে ধূসর হতে দেখে অনেক সময়, কিংবা সে ধরেই নেয় বর্ণিল জীবনটা হয়তো বর্ণহীন হয়ে পড়ছে... শুরু হয় সংঘাত। এটা সংঘাত না রূপান্তর বলবো?

সবাই বললো, স্বামীটিকে বলুন কুমড়োর সঙ্গে ফুলও নিয়ে আসতে। কুমড়ো ফুল হতে পারে।

অন্যজন উত্তর দিলো, স্বামীটির যা মনোভাব তাতে কুমড়ো ফুলটাও ভেজে দিতে বলবে!

সুচরিতা বললেন, উত্তর কিন্তু স্বামী চাচ্ছে না। চাচ্ছে স্ত্রী। স্বামী চাইলে উত্তর দেয়া সহজ হতো। আমি এই স্ত্রীকে কি করে বোঝাবো এটাই স্বামীর সংসারের কমিটমেন্টের বহিঃপ্রকাশ। স্বল্পতার মধ্যে আনন্দে ভরে রাখতে চান সঙ্গীটিকে।

সবাই একটু থমকে গেলো।

মুখ খুললেন সুচরিতা। এই প্রেমিক-প্রেমিকাই যখন সব সমস্যা কাটিয়ে বিয়ে করে তখন তাদের যেন বাঁধাহীন জীবন। কোনো সমস্যাই থাকে না। ঘোরের মধ্যে বসবাস, অনেকটা প্রেম জীবনের শুরুর মতো। এভাবে চলে কয়েক দিন। তারপর দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। স্বপ্ন আর বাস্তবের। প্রেম জীবনের স্বপ্নগুলো বিবাহিত জীবনের বাস্তবতায় সে ধূসর হতে দেখে অনেক সময়, কিংবা সে ধরেই নেয় বর্ণিল জীবনটা হয়তো বর্ণহীন হয়ে পড়ছে... শুরু হয় সংঘাত। এটা সংঘাত না রূপান্তর বলবো? আলোচনা গড়িয়ে চললো।

প্রথমেই আসে কিশোর বয়সের কথা। এ সময়ে সবকিছুই ভালো লাগে। উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত চারপাশ। পাশের বাড়ির মেয়ে, ক্লাসের লাজুক মেয়ে কিংবা কথা কাটাকাটি হওয়া কোনো বন্ধুর জন্য হঠাৎ মন আনচান করে ওঠে। একটি মেয়ে ভাবা শুরু করে তার জন্য ছেলেটি কতই না ভাবছে, কতই না গুরুত্ব দিচ্ছে তাকে। শুরু হয় দুর্বলতা। তারপর কয়েক দিন একসঙ্গে বসে আড্ডা, কোনো ফাস্ট ফুডের দোকানে, রাস্তায় ঘোরাঘুরিতে কত পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নিয়ে কথার ঝড় তোলা। দুর্বলতা বাড়তে থাকে। একজন অন্যজনের প্রতি নির্ভরতা অনুভব করতে শুরু করে। একজন অন্যকে ভালোবাসে এটা ভাবতেই তখন ভালোবাসে তারা। স্বপ্নের কথা বলা, স্বপ্ন দেখার শুরুও তখন। বাস্তবতার অনেক বাইরের জগতে অবস্থান তাদের। কোনো দায় দায়িত্ব নেই। এই সময়টাকে সবচেয়ে মধুর মনে করেন অধিকাংশ প্রেমিক-প্রেমিকা। অবশ্য কারণও আছে, তখন যা ইচ্ছা তাই-ই করা হচ্ছে। অবশ্য তা বাস্তবে নয়, স্বপ্নের আঙ্গিনায়। এ স্বপ্নগুলোকে প্রেমে বাঁধতে চায় সবাই, নিয়ে চলতে চায় জীবনভর। তখন প্রয়োজন হয় সামাজিক সম্পর্ক, বিয়ের। হিসাব-নিকাশহীন প্রেমজীবনে শুরু হয় অঙ্ক কষা। বাড়িতে কে কে বাধা দিতে পারে তাদেরকে জীবনশত্রু মনে করা হয় সেই সময় থেকেই। আর যে সাহায্য করবে সেই হয়ে ওঠে পরম শ্রদ্ধাভাজন অথবা বন্ধু। এই সময়টা প্রেমজীবনের সবচেয়ে টেনশনের। অবশ্য এর মাঝে অনেক ভালোবাসাও থাকে। প্রেমিকের চিন্তা শুরু হয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার। কাজের প্রতি গুরুত্ব বাড়ে অনেক। প্রেমিকাকে দিতে পারে না আগের মতো সময়। এ নিয়ে চলে কথা কাটাকাটি। বড় ধরনের অসম বিষয় না থাকলে এখনকার মা-বাবা বাধা দেন না প্রেমের বিয়েতে। সুচরিতা বললেন, আমাদের সমাজে এখন ছেলে-মেয়েরাও নিজেদের পছন্দ ও অপছন্দ বেশ হিসাব নিকাশ করেই করে। আগে প্রেম করার জন্য প্রেম করতো, এখনকার ছেলেমেয়েরা বেহিসাবি, কমিটমেন্ট করে কম। বাবা-মাও মনে করে ছেলেমেয়েরা নিজ বুদ্ধিতেই জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করবে। বাবা-মা বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করবে।

প্রেমের সময় এক সঙ্গে জীবন চলার যে আকুতি প্রতিনিয়ত তীব্র হয় তা যখন সফল হয় তখন যেন গোটা পৃথিবী হাতে এসে পড়ে। এ সময়ের অনুভূতি থাকে প্রেমজীবনের শুরুর মতো। ঘর সাজানো, এক সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরির আনন্দে কেটে যায় মধুর সময়। কেননা এখন অধিকাংশ বিয়ে হচ্ছে কাছাকাছি বয়সীদের মধ্যে। ছেলেটি মুরব্বি সাজতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে এখন ছেলেটা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিয়ে করে বসেছে। তাকে প্রথমেই হিমশিম খেতে হয় বিরাট দায়িত্ব নিয়ে। বেশি চেনাজানার সমস্যা আছে। বরং বলা যায় যে, সমস্যাটা পরে হতো এটা প্রথমদিকেই ধরা পড়ে। তারা সমাধানেরও চেষ্টা করে। এখন আরো একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এখনকার প্রজন্মের ভাইবোনের সংখ্যাও কম। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ পরিবারের সন্তানের সংখ্যা দুই, খুব বেশি হলে তিন। তাই বাবা-মা'রা তার সন্তানের জন্য খুউব বেশি উদগ্রীব থাকেন। ছেলের মা চাচ্ছেন ছেলে তার বাসাতেই থাকবে, তাকে দেখেশুনে রাখবে, তার কথা শুনবে। আবার মেয়ের মা'ও চাচ্ছেন তার মেয়ের সব বিষয়ের খোঁজখবর তিনি রাখবেন। তার সরাসরি স্নেহ-আদরের যেন কমতি না ঘটে সেটা নিয়েও তিনি চিন্তিত থাকেন। দুই পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা

দেয়। এর প্রভাব পড়ে নবদম্পতিটির ওপর। বিবাহিত জীবনের প্রথম সংঘাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষকে কেন্দ্র করেই ঘটে। আর এ ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য যে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন তা অধিকাংশ সময় নিতে ব্যর্থ হয় স্বামী, স্ত্রী। স্বামীটি ভাবে সারাক্ষণ অফিস করে বাসার ফিরেই এসব শুনতে হবে...। আর স্ত্রীর মনে হয় আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, ও কেন আমার পাশে দাঁড়াবে না। দুজনের ভাবনাতেই যুক্তি আছে। আর এ ভাবনাই প্রতিদিন নতুন ভাবনার সৃষ্টি করে, বাড়ে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব।

একজন বললেন, এ সময়ের চাকরির ধরন পালটে গেছে, যানজটও কিন্তু সংসার জীবনে আঘাত করছে। যেমন ধরেন ছেলেটি একটি প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি করে। সে বাড়ি ফেরে ৮টা ৯টায়। তার স্ত্রীও চাকরি করে। সে ফেরে ৬টা সাতটায়। তাদের প্রতিদিনের রুটিনটা একটু চিন্তা করুন। এরাই ছাত্রজীবনে প্রেম করত, কত স্বপ্ন দেখত, দেখাত, এখন স্বপ্ন দেখার সময়ই নেই। হঠাৎ যখন মনে হয় সেই মধুর সময়ের কথা তখন বিরক্ত হয় এই ছক কাটা জীবনে। অথচ এর থেকে মুক্তি নেই। জীবন চালানোর জন্যই তাদেরকে এ পথ ধরতে হয়েছে। জীবন চক্রে পড়ে গেছে, এর কোনো বিকল্প নেই। তো সাতটার বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীর কাছে শুনতে হতে পারে বাসার কোনো কিছু নিয়ে সমস্যার কথা, কিংবা অতিথি আপ্যায়নেই চলে যায় ঘন্টা দুয়েক। তার নিজের কোনো সময় থাকে না। ক্লান্ত শরীর, মনে কোনো সমস্যার কথা শুনতেই তখন ভালো লাগে না। আবার কারো সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও করতে পারে না। মনের মধ্যে জমতে থাকে অনেক কথা, কষ্ট, যন্ত্রণা। বাঙালি নারীর জন্য এ ব্যাখ্যাটা অনেক শাশ্বত। আগের প্রজন্ম এটাকে অবধারিত মনে করে গায়ে লাগাত না। আজকের প্রজন্ম চায় স্বামীর সঙ্গে শেয়ার করতে। আর রাত ৯টার পরে বাসায় এসেই এসব নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী তো নয়ই বরং অনেক বেশি বিরক্ত হয় তরুণ স্বামীটি।

বিয়ের বন্ধনে বন্দিত্ব অনুভব করা শুরু করে দু'পক্ষই। সমস্যা আরো বাড়ে ছুটির দিনে। সপ্তাহের একটি মাত্র দিন নিয়ে থাকে দু'জনের অনেক চিন্তাভাবনা। দু'জনই নিজেদের পছন্দ মতো কাটাতে চায় সময়। তখন পছন্দ না মিললেই বাধে গন্ডগোল। অবশ্য ছুটির দিনে প্রায়ই থাকতে পারে দাওয়াত। দেখা যায় মাসে দুই থেকে বড়জোর তিন দিন এখনকার স্বামী-স্ত্রী একজন অন্যকে ভালোভাবে সময় দিতে পারে। এ সময়ে যত না স্বপ্নের কথা হয়, ভালোবাসার কথা হয় তারচেয়ে বেশি হয় দায়িত্ব, সমস্যার কথা। সম্পর্কের মধুরতা এভাবে অনেক কমে যায়। এর জন্য অবশ্য দায়ী দু'পক্ষই। স্বামী মনে করে ও তো আমার স্ত্রীই, ওর জন্য ফুল নিয়ে যাবার দরকার কি! তখন স্ত্রীটি ভাবে আমাকে আর ভালোবাসে না ও। স্বামীটি হয়ত দেখা গেল বাজারের হিসাব নিকাশ করতেই ব্যতিব্যস্ত।

প্রেম তখন থাকে না পার্কে বসে বাদাম খাওয়াতে। প্রেম বা বন্ধুত্ব চলে যায় রাতের খাওয়ার টেবিলের আলোচনায়। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে, হতে পারে অফিসের বা বন্ধুদের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনাতে, আবার হতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাফল্যের ব্যর্থতায় অনুভূতি ভাগাভাগিতে প্রেম খুঁজে বেড়ায় স্বামী-স্ত্রী।। এটা মেনে নেয়া, না নেয়ার ওপর নির্ভর করতে পারে বিবাহিত জীবনে প্রেম টিকে থাকা, না থাকাতে। রোমান্টিকতা শুধু ফুলেল বা কার্ডের শুভেচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা থাকলে তা হারিয়ে যায় খুউব দ্রুত। আমাদের সমাজে সেটা খুব বেশি বাস্তব এখন।

একটা সময় ছিল সুখ মানে বউ কত মেনে চলে। এটা একান্নবর্তী পরিবারে হয়তো দরকারও ছিল কিন্তু এখন অনেক পুরুষরা পছন্দ করে বলতে যে তার স্ত্রী তাকে ভয় পায় বা খুউব শাসনে থাকে তার সঙ্গী। স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে এ কথাটা কখনোই সে বলে না। স্ত্রীকে একটু কেয়ার করলেই বন্ধুরা, আত্মীয় স্বজন তাকে বউ পাগলা, স্ত্রৈণ বলে টিটকারি দেয়। আমাদের সমাজে, সাহিত্যে কোথাও স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার প্রকাশ নেই। সবই চলে গোপনে। কোথাও আদরের কথা নেই, শুধু আছে শাসন আর দায়িত্বের কথা। আর ভালোবাসার কথা থাকলেও সেটাকে দেখানো হয় স্বর্গীয় অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করে এবং গোপনীয়। কামের প্রসঙ্গ সব ক্ষেত্রেই রাখা হয়েছে উহ্য। আগে স্বামীকে বন্ধু করা হয়নি, করা হয়েছে 'পরমেশ্বর'। তাই স্বামী-স্ত্রী সহজ হতে পারেনি পারিপার্শ্বিকতার কারণে।

বিবাহিত জীবনের বয়স যতো না বাড়ে বছরে তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায় মানসিকতায়। মানুষ বৈচিত্র্যহীনতায় ক্লান্তি বোধ করতে বাধ্য হয়। পঞ্চাশ বছর বয়সেই স্বামী মনে করে তার দাম্পত্য জীবন শেষ, বাকি সময়টা কাটানো বাধ্যবাধকতা। সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিত্রটি বদলেছে। সে জন্যও কনট্রাডিকশন হয়। যেমন পঞ্চাশোর্ধ্বে স্বামী-স্ত্রী এখন তাদের শরীর চাহিদাকে এড়িয়ে চলে না, চলতে চায় না। অথচ প্রচলিত ধারণা সন্তান এবং অন্যদের জন্য বেঁচে থাকা, দায়িত্ব পালন। অবশ্য এ ভাবনা শুরু হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মাঝামাঝি সময় থেকেই। কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রেম হারিয়ে যায়, আমরা হারিয়ে ফেলি আরো আগে আমাদের মানসিক দৈন্যতা, ভুল বোঝাবুঝি আর অর্থনৈতিক অক্ষমতাকে চাপা দেবার চেষ্টার জন্যই। তরুণ স্বামীটি কিংবা প্রবীণ স্বামীটি অনেক

স্বামী মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ডাক্তার। স্বামী তাকে নিতে চায়। কিন্তু প্রবাসে বাচ্চাদের পড়াশোনা অন্যান্য বাড়িভাড়া খরচ যা তাতে টাকা জমবে না বলে সুখের জন্যই ঢাকায় থাকতে হয় স্ত্রী সন্তানদের। মেয়েটি জানতে চেয়েছিল এই দুর্বিষহ অনিশ্চিত জীবনের মানে কি? আমি উত্তর দিতে পারিনি। কি উত্তর দেবো এর

সময় ভাবা শুরু করেন এতো পরিশ্রম করে কি পেলাম। দরিদ্র রাষ্ট্রের একজন পরাজিত নাগরিক হিসেবে মনে করতে শুরু করেন নিজেকে। আর পরাজিত মানুষের ক্ষোভের কোনো শেষ নেই। তখন তার সম্বল থাকে, অবলম্বন থাকে শুধু ভাবনাহীন কৈশোর। কৈশোরের হারিয়ে যাওয়া সুখকে এ বয়সে ধরতে না পেরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে ক্লান্তিকর জীবনে।

সুচরিতা আরো একটি গল্প বললেন, দেখুন আমাদের দরিদ্র দেশে ভালো থাকার লড়াইটাই কঠিন। সে জন্য অনেক 'প্রেম'কে হৃদয়হীন মনে হয়। যেমন বছর চার আগে একটি মেয়ে চিঠি লিখেছিল যে সে ঢাকায় একা মায়ের বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া করে থাকে। দুটো সন্তান স্কুলে পড়ে। নিজে ছোট একটা চাকরি একটি স্কুলে। স্বামী মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ডাক্তার। স্বামী তাকে নিতে চায়। কিন্তু প্রবাসে বাচ্চাদের পড়াশোনা অন্যান্য বাড়িভাড়া খরচ যা তাতে টাকা জমবে না বলে সুখের জন্যই ঢাকায় থাকতে হয় স্ত্রী সন্তানদের। মেয়েটি জানতে চেয়েছিল এই দুর্বিষহ অনিশ্চিত জীবনের মানে কি?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। কি উত্তর দেবো এর? মাত্র কয়েকদিন আগে সেই মেয়েটির একটি চিঠি পেলাম। লিখেছে জানি না আমার চার বছর আগের চিঠিটি আপনার হাতে পৌঁছেছিল কিনা। চিঠি পেয়েও উত্তর না দিয়ে থাকলে বলবো আপনি ঠিক কাজই করেছিলেন। আজ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উত্তর না দেয়ার জন্য। চিঠি লেখার দু' আড়াই বছর পর আমার স্বামী দেশে ফিরেছে। এক মাসের মধ্যে উত্তরায় বড় একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। ছয় মাসের মাথায় ছোট একটা গাড়ি। সুন্দর করে সাজিয়েছি নিজেদের ফ্ল্যাটটি। ও চাকরি নিয়েছে একটি মেডিকেল কলেজে। বিকালে প্র্যাকটিস করে একটি ওষুধের দোকানে। ভালো পসার। ফ্ল্যাট কেনা হয়ে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল তোমার কষ্টের ফল, এটা তোমারই। মেয়েটি সবশেষে লিখেছে, আমাদের সুষ্ঠু সুখী নিশ্চিত অবস্থানে পৌঁছাতে বিয়ের পর ১৪ বছর লেগেছে। অনেক কষ্ট করেছি, এখন বলতে পারি আমি সুখী। আসলে সুখ প্রেম কোনোটি একক ইচ্ছের ব্যাপার নয়। দারিদ্র্য আমাদের পিছু টেনে ধরে। সময়টি এখন সমাজ পরিবার সংগঠনের একটি ক্রান্তিকালীন সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রেক্ষাপট পেয়েছে একটি সমাজ কিন্তু সমাজের দেহে বিকাশ লাভ করতে পারছে না। যেমন ছোট সংসার আরো ছোট হচ্ছে। দু'জন চাকরি করছে। নাগরিকতার রূপ বদলে যাচ্ছে আমাদের অজান্তে। যার জন্য যাদের বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে তাদের জীবনযাপনের ধারার সঙ্গে নব দম্পতির জীবনের ধ্যানধারণা বদলে গেছে। এটাকে সমাজ অবলোকনকারীরা নেতিবাচক ভাবে দেখছে।

আরেকটা দিক হলো 'প্রেম' সম্পর্কে অনেকের কাছে এখনো ধারণা অপার্থিব। এটাকে জীবনযাপনের অংশ ধরে নিয়ে দৈনন্দিনকতায় 'ম্লান' করতে চায় না। অথচ বিবাহিত প্রেমই কিন্তু সভ্যতার অংশ হিসেবে থাকে। যেমন প্রজন্ম সংরক্ষণ আত্মপরিচিতি। এবং সবচে' বড় কথা শেষ জীবনের সঙ্গী। এক পর্যায়ে দু'জনেই দেখে দু'জনের জন্য শুধু দু'জনই আছে। আছে ছেলে মেয়েরা। একজন ষাটের কোঠায় এসে পড়া সাংবাদিক বললেন, আমি বেশ অসুস্থ। সব কিছুতে সাহায্য লাগে। এখন আমার সবচে' বড় বন্ধু হলো আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা।

এই বন্ধুত্বই কি প্রেম নয়?

প্রতিটি মানুষের মনে প্রেম সব সময়, সব বয়সেই থাকে। প্রকাশ হতে পারে ভিন্নতায় নানা রূপে কখনো শুধু কথা বলায়, চোখে চোখ রাখাতে, কখনো জড়িয়ে ধরাতে, কখনো আগলে রাখাতে, কখনো বন্ধুত্বে, কখনো বিশ্বস্ততায়, কখনো স্বপ্নময় জীবন পাড়ি দেয়াতে, কখনো দুর্বিষহ দিন পরস্পরের হাত ধরে কাটাতে, আবার কখনো সব কিছুর মাঝে। এখন প্রেম কেবল একটি সনেট নয়। জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রেমকে ধরতে হবে মহাকাব্য হিসেবে। যেখানে চড়াই উৎরাই আছে। প্রেমের মাঝে থাকে সব অনুভূতি। থাকে ভালোবাসা, কাম সবকিছুই। এর কোনোটা অস্বীকার করার মানসিকতাই তৈরি করে দৈন্যতা। বিবাহিত জীবনে আমরা এসব ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে চাই অনেক সময়। বিশুদ্ধ কামনার কথা বলতে, স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হই। মানসিক নির্ভরতাকে পাশ কাটিয়ে থাকতে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করি কিংবা ব্যর্থ হই বাস্তব জীবনে মনের মিল না হওয়াতে। একজন চায় গোলাপ ফুল, অন্যজন পেঁয়াজ, রসুনের হিসাবে ব্যস্ত। প্রয়োজন দুয়ের মধ্যে সমন্বয়। এবং তা খুউবই সম্ভব। একটু সমঝোতা করতে হতে পারে। আবার মনে রাখতে হবে বন্ধনের বন্দিত্ব কিন্তু ক্লান্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারে সম্পর্ককে। মনকে সাজানো প্রয়োজন বাস্তবতার রঙ তুলি দিয়েই, অলীক স্বপ্ন দিয়ে নয়। স্বপ্ন-কল্পনা সবই থাকবে দু'জনের হাত ধরে সামনে চলাতে। স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা বা রাজপুত্র আসলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ে নয়, আছে খুউব কাছে, কাছাকাছিতেই...

'প্রেম' সম্পর্কে অনেকের কাছে এখনো ধারণা অপার্থিব। এটাকে জীবনযাপনের অংশ ধরে নিয়ে দৈনন্দিনকতায় 'ম্লান' করতে চায় না। অথচ বিবাহিত প্রেমই কিন্তু সভ্যতার অংশ হিসেবে থাকে। যেমন প্রজন্ম সংরক্ষণ আত্মপরিচিতি। এবং সবচে' বড় কথা শেষ জীবনের সঙ্গী। এক পর্যায়ে দু'জনেই দেখে দু'জনের জন্য শুধু দু'জনই আছে। আছে ছেলে মেয়েরা

হয়তো আছে আপনার মনের ভেতরই। মানবিক হৃদয়টা মেলে ধরুন, ভালোভাবে তাকিয়ে দেখুন রান্না ঘরের দিকে পেয়াজের ফোড়ন দিচ্ছে যে সে সংসারটা এগিয়ে নিচ্ছে আরো একটি দিনের দিকে। তাকিয়ে দেখুন অফিস মানুষটির দিকে। এক কাপ চা দিলেই তোয়ালে দিয়ে মুখটি মুছে বলবে, তুমি কোনোদিনই ভুল করো না।